Q:4শিশু সাহিত্যে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান আলোচনা কর।

নব্য ভারতীয় চিত্রকলার জনক অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১ - ১৯৫১) তার রূপ দক্ষ মেজাজে তুমুল আলোড়ন তুলে, হৈ-চৈ বাঁধিয়ে দিয়েছিলেন শিশুদের মনোজগতে। অসামান্য চিত্রল বর্ণনা, সরল বাক নৈপুণ্য এবং কাহিনীর স্বকীয় উপস্থাপন রীতি তাঁকে শিশু সাহিত্যে স্থায়ী আসন দিয়েছে। ঠাকুর বাড়ির রীতিমাফিক গৃহশিক্ষায় বিদ্যার্জন। তবে বাঁধন হারা উচ্ছ্বাস, সৃষ্টিছাড়া মনকে যখনি নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষার বেড়াজালে আটক করার ষড়যন্ত্র টের পেয়েছেন, রবি কাকার মতন তখনই ছিন্ন করেছেন নিয়মতন্ত্রের শৃঙ্খল। দুজনের সাহিত্যেই তাই বাঁধভাঙা মুক্তির উচ্ছ্বাস। অবনীন্দ্রনাথের শিশু সাহিত্যেও এই মুক্তির পাগল হাওয়া। তাঁকেই সমৃদ্ধ করেছে তাঁর অনুভবী শিল্পী মন। গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজের ছাত্র, শিশু সাহিত্যে ছড়িয়ে দিলেন রং এর বর্ণালী।

তাঁর শিশু সাহিত্যে আগমন মূলত রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা ও পরিকল্পনাতে। প্রচুর লেখা থাকলেও গ্রন্থবদ্ধ হয়নি সব।'শকুন্তলা'(১৮৯৫) 'ক্ষীরের পুতুল'(১৮৯৬),'রাজকাহিনী', (১৯০৯,১৯৩১), ' ভূত পতরীর দেশ'(১৯১৫), 'নালক'(১৯১৬), 'খাজাঞ্চির খাতা'(১৯২১), 'বুড়ো আংলা'(১৯৪১), 'ঘরোয়া'(১৯৪১); জোড়াসাঁকোর ধারে (১৯৪৪), 'আলোর ফুলকি'(১৯৪৭), ''হংস নাম' পালা (১৯৫১), 'মাসি'(১৯৫৪), 'লম্বকর্ণ পালা'(১৯৫৪), ইত্যাদি।

ইতিহাস, রূপকথা, অ্যাডভেঞ্চারের ত্রিবেনী সঙ্গমে, কাহিনীর পক্ষীরাজে বসিয়ে ছোটদের নিয়ে যেতেন সুদূর কল্পনা - রাজ্যে। গল্প পরিবেশনে সম্পূর্ণ বৈঠকী মেজাজ। তার পাঠক নির্ভেজাল শৈশব রাজ্যের বাসিন্দা। তাই মূলত তিন রকমের প্রবণতায় তাঁর শিশু সাহিত্য নির্মিত। প্রথমত রূপকথার রাজ্য ('শকুন্তলা' 'ক্ষীরের পুতুল')। আঙ্গিকগত না, ভাবগত দিক দিয়ে দ্বিতীয়ত -ইতিহাস ও লোক শ্রুতির সম্ভাব্য - অসম্ভাব্য রাজ্য ('রাজকাহিনী' 'বাদশাহী গল্প')। তৃতীয়ত সাহিত্যের পুনর্নির্মাণ ('বালক' 'ভূতপতরীর দেশে ' ,'বুড়ো আংলা') অ্যাডভেঞ্চার ও রূপকথার মিশেলে দেশি-বিদেশি সাহিত্যের যে জগত, তা এক কথায় সাহিত্যের পুনর্নির্মাণ।

স্বভাবলাজুক কোবির রূপকথার রহস্যময় পরিবেশের বপন হয় কাকিমা খুড়িমার হাতে। তাই পরবর্তীতে লোক জীবন আর লোকশিল্পের প্রতি তাঁর এত টান। সেখান থেকে মুক্ত বায়ুর সন্ধান রবীন্দ্র সান্নিধ্যে। মৃণালিনী দেবীর রূপকথা সংগ্রহ থেকেই 'ক্ষীরের পুতুল'এর কাহিনী সংগ্রহ হয়। আর 'শকুন্তলা'র রচনা কৌশল ও কাহিনী পরিবেশনের ঢঙ মনে করিয়ে দেয়, গল্পকে আঁকেন অবন ঠাকুর। সেই রীতি বজায় আছে 'ক্ষীরের পুতুলে' এ। তবে প্রচলিত রূপকথা (লোক কাহিনী) ও ষষ্ঠী ব্রতর আধুনিকীকরণ হয়েছে এখানে। রাজা রানী রূপকথার চেনা গল্পে প্রবেশ করেছে-বাবা মায়ের সুস্থ সবল সন্তান লাভের সুপ্ত কামনা। লোক জীবন থেকে আহরিত ছড়া আর কিংবদন্তি বানরের দিব্যস্বপ্ন বর্ণনায় - ১)'আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে', ২)'খোকা যাবে মাছ ধরতে ক্ষীর নদীর কূলে' ৩)'না নিয়ে গেল বোয়াল মাছে', বা 'শিব ঠাকুরের বিয়ে হল তিন কন্যে দান' ইত্যাদিতে রূপকথা ধর্মী তাঁর লেখণী স্বকীয়তা এনেছে।

'রাজকাহিনী'র মধ্যে মোট ৯টি কাহিনী 'মেবার' রাজবংশের নির্বাচিত কয়েকজনকে নিয়ে। তবে এটি ইতিহাস নয়, ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে জমে থাকা লোক শ্রুতির চূর্ণ। ইতিহাসের কাহিনীকে ব্যবহার করেছেন শিশু পাঠ্য কাহিনীর অবয়ব নির্মাণে। অথচ পরিবর্তে রূপকথাই প্রধান হয়ে উঠেছে। ইতিহাসকে ছোটদের কাছে পৌঁছানোর জন্যই রাজা- রাজড়া দের গল্প কাহিনী পর্যবসিত হয়েছে কল্পনার বিস্ময় মাখানো পথে।

আবার ছোটদের কাছে বিস্ময় জাগানোর হাজারো উপকরণ নিয়ে 'বুড়ো আংলা'ও হাজির। ছোটদের আকর্ষণ করার পাশাপাশি এই গল্পে অপসৃয়মান মানবতা বোধের উজ্জীবনের মন্ত্র রয়েছে। ইঁদুর ,বোলতা ,চিংড়ি মাছ , পাঁঠা, গোখরো সাপ, ডাঁস, ছাতারে পাখি কি নেই এখানে। 'নালক'এ জাতকের গল্প বলতে গিয়ে রূপকথার জাল বুনেছেন। গল্পের শেষে নালক 'যখন ফিরে এসেছে নিজের বাড়িতে, এখন গৃহ গত প্রাণ বাঙালির মতোই নিজের চেনা রূপসী বাংলাকে মায়াময় চোখে উপলব্ধি করেছেন।'মারুতির পুঁথি', 'চাঁই বুড়োর পুঁথি'-রামায়ণ কাহিনীর উপাদান অবলম্বনে তৈরি। গদ্যে- পদ্যে কথকতা এগিয়ে চলে এখানে। এভাবেই নিজস্ব কথন শৈলী গড়ে তোলেন তিনি- রূপকথার মত ছোট ছোট বাক্যে ছবির পর ছবি আঁকা। এলোমেলো খেয়ালি কথাও ঢুকে যায় তাতে। এমনটা রূপকথাতেই সম্ভব, কিন্তু এ রূপকথা শুধু শিশুর নয়, সব বয়সের মানুষকেই অপ্রতিরোধ্য টানে।

তিনি চিত্রশিল্পী। গল্প গঠনেও তাঁর সেই পরিচয় বড় হয়ে উঠেছে। তাঁর ভাষা হয়ে উঠেছে তুলিতে রং এ আঁকা ছবি। ছবির পরে ছবি সাজিয়ে গল্প গুলি হয়ে উঠেছে চলচ্চিত্র। বাংলা বাল্যসেব্য গল্প অনন্য রূপমূর্তি ধারণ করলো অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতেই।

- আত্রেয়ী মাল
বিভাগীয় শিক্ষিকা, বাংলা বিভাগ
খেজুরী কলেজ ॥